ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 147-153
www.athenajournalcbm.in

উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ ব্যবস্থা

শুভেন্দু বিশ্বাস*

প্রাপ্ত: ০৭.০১.২০২৪ পরিমার্জন: ১৩.০৫.২০২৪ গৃহীত: ২১.০৬.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *ঔপনিবেশিক সময়ে দুর্ভিক্ষ-রোগ-ব্যাধি-মহামারী সাধারণ মানুষের জীবনে অভিশাপ হিসেবে নেমে এসেছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখলের সাথে সাথেই বাংলাতে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। যা ১৭৭০ সালের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এর পরবর্তী সময়ে বাংলাতে বেশ কয়েকবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। যদিও অঞ্চল ভেদে সেই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার তারতম্য লক্ষণীয়। দুর্ভিক্ষ বলতে কোনো এলাকায় ব্যাপক আকারে খাদ্যের ঘাটতিকে বোঝায়। অবশ্য দুর্ভিক্ষের পেছনে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ দায়ী ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গবাদি পশুর মড়ক, পোকার আক্রমণ প্রভৃতি কারণে দুর্ভিক্ষ হতে পারে। আবার ফসলহানী, সরকারের খাদ্যনীতির ব্যর্থতার জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল শুধুমাত্র নবাবদের রাজধানী হিসেবে নয়, কৃষি উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিল। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ সমগ্ব বাংলার সাথে সাথে মুর্শিদাবাদ জেলার উপরও আঘাত হানে। পরবর্তী সময়ে একাধিকবার মুর্শিদাবাদ জেলাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অবশ্য মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষের পেছনে বন্যা, খরা এবং সরকারের ব্যর্থ খাদ্যনীতি দায়ী ছিল। ঔপনিবেশিক সময় থেকেই এই জেলাতে বন্যা বার্ষিক উৎসবের মতো দেখা দিত। আর বন্যা পরবর্তী ফসলহানী, রোগ ও মহামারী জেলাবাসীর জীবনে দুঃস্বপ্ন বহন করে নিয়ে আসে। সুতরাং আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধে উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষের কারণ এবং ত্রাণ ব্যবস্থার ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হবে।*

সূচক শব্দ: *দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মহামারী, দুর্যোগ, মড়ক।*

*পিএইচ.ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: subhendub47@gmail.com

ঔপনিবেশিক সময়ে দুর্ভিক্ষ-রোগ-ব্যাধি-মহামারী সাধারণ মানুষের জীবনে অভিশাপ হিসেবে নেমে এসেছিল। তবে এই গবেষণা নিবন্ধের মূল আলোচনার বিষয় হলো—দুর্ভিক্ষ। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়েছিল। ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায়। এর ঠিক পাঁচ বছর পর বাংলার বুকে নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। ইতিহাসে যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এরপরেও একাধিকবার বাংলার বুকে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ। অবশ্য অঞ্চল ভেদে দুর্ভিক্ষের প্রকোপের তারতম্যও লক্ষ্য করা যায়। একদা বাংলা সুবার রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদের যেমন খ্যাতি ছিল। ঠিক তেমনই অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলা সুবার একটি সমৃদ্ধশালী জেলা হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু উনিশ শতকে এই মুর্শিদাবাদ জেলাতে দেখা দেয় একের পর এক দুর্ভিক্ষের প্রকোপ। আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধে উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ ও ত্রাণ ব্যবস্থার ইতিহাসের উপর আলোকপাত করা হবে।

দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'ফেমিন' (Famine)। দুর্ভিক্ষ বলতে বোঝায় আকাল বা ব্যাপক খাদ্যাভাব।[১] আর মন্বন্তর শব্দটি প্রচলিত অর্থে দুর্ভিক্ষ বা আকালকে বোঝায়। অবশ্য ড. বিনতা রায়চৌধুরী মনে করেন 'মন্বন্তর' কথাটি মনুর শাসনকালে বন্যা, বিপ্লব, প্রলয়, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি অর্থ বহন করে।[২] 'ভারতকোষ'-এ দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। এখানে বলা হয়েছে 'প্রাকৃতিক অথবা মানবিক কারণে সংঘটিত খাদ্যশস্যের অভাবের ফলে ব্যাপক অন্নকষ্ট সৃষ্টি হয়। সাধারণত বহু স্থলে খাদ্যাভাবে মৃত্যু ঘটিলে তবেই অবস্থাটিকে দুর্ভিক্ষ বলা হয়'।[৩] এখান থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে সংঘটিত হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে অতিবৃষ্টি বন্যা, খরা ইত্যাদি দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী।

দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর নতুন কোনো বিষয় ছিল না। সেই প্রাচীন কাল থেকেই এদেশের মানুষ দুর্ভিক্ষের সাথে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্য আমলের একটি লেখ থেকে উত্তর বাংলাতে দুর্ভিক্ষের কথা জানা যায়।[৪] এছাড়াও বাংলাতে দুর্ভিক্ষের আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। নবম শতকে রচিত 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' গ্রন্থে পূর্ব বাংলাতে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে জানা যায়।[৫]

মধ্যযুগে ভারতেও বহুবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিনীতে, ৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন।[৬] ১২৫৬-৫৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি ও গুজরাটে, ১৩৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি ও দোয়াবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[৭] অবশ্য এই দুভিক্ষের কারণ ছিল দীর্ঘকালব্যাপী খরা। মোঘল যুগে জাহাঙ্গিরের সময় দুই বার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তবে সম্রাট শাহজাহানের সময় দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করে। তাঁর আমলে ২৫ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[৮] ঔরঙ্গজেবের আমলেও বেশ কয়েকবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। মধ্যযুগে ভারতের অন্যান্য জায়গার সাথে সাথে বাংলাতেও বেশ কয়েকবার দুর্ভিক্ষের ছায়া নেমে এসেছিল। তবে অঞ্চল ভেদে দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতার পার্থক্য বরাবরই থাকে। যেমন বাংলাতে দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী হলো ঘনঘন বন্যা, ভারতের অন্যান্য স্থানে দুর্ভিক্ষের কারণ হলো খরা।[৯] অবশ্য সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর ঘটত প্রাকৃতিক কারণে।

তথ্যগত অপ্রতুল্যতার কারণে প্রাক-ঔপনিবেশিক মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে জেলার কৃষি ব্যবস্থার সাথে বাংলার অর্থনীতির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং কৃষি কাজের জন্য মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং, অনুমান করা যায় যে, মোঘল আমলে বাংলা সুবাতে যে দুর্ভিক্ষগুলি হয়েছিল, সেগুলির প্রভাব মুর্শিদাবাদেও পড়েছিল। এই জেলাতে দুর্ভিক্ষের পেছনে প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানবিক কারণও দায়ি ছিল। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে বন্যা ও খরার প্রকোপের ফলে ব্যাপক মাত্রায় শস্যহানী ঘটে। এর সাথে যুক্ত হয় মহামারী। আর মানবিক কারণের মধ্যে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া, কালোবাজারির ফলে খাদ্য চলাচলে বাধার সৃষ্টি ইত্যাদি। উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলাতে বেশ কয়েকবার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ নেমে আসে। অবশ্য সেই দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

মুর্শিদাবাদ জেলাতে প্রথম দুর্ভিক্ষ দেখা যায় বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরেজি ১৭৭০)।[১০] যেটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামেও পরিচিত। দুই বছর পর পর খরা দেখা দিলে মাঠের শস্য মাঠেয় শুঁকিয়ে যায়। ১৭৭০ সালের জুলাই মাসে বৃষ্টি শুরু হলে জেলাবাসী সুখের ঘর বাঁধতে থাকে। কিন্তু মানুষের সেই আশাতে জল ঢেলে দিয়ে দেখা দিল বিধ্বংসী বন্যা। বন্যার সাথে সাথেই রোগ ও মহামারির প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। গুটি বসন্ত রোগে নবাব সইফ-উদ-দৌলা মারা যান।[১১] এর সাথে যুক্ত হয় খাদ্যাভাব এবং খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি।[১২] মানুষের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ থাকলে আকালের সময় খাদ্যপণ্য ক্রয় করে জীবন ধারণ করতে পারতো। কিন্তু এই সময়ে খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়, যা মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। স্বাভাবিক সময়ে বাংলার বাজারে যে চাল টাকায় ২৮ সের পাওয়া যেত। ১৭৭০ সালে জুন মাসে মুর্শিদাবাদে তা বিক্রি হত টাকায় ৬ সের।[১৩] মুর্শিদাবাদের দরবারে নিযুক্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রিচার্ড বীচার জানিয়েছিলেন— "১৭৭০ সালে জুন মাসে রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহরের তিরিশ মাইলের মধ্যে বেশ কিছু দিন ধরে কোনো খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছে না"।[১৪] সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, খাদ্যশস্যের ব্যাপক মাত্রায় ঘাটতির ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চরমে ওঠে। খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা যেতে থাকে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার সেনাবাহিনীর খাদ্যের জন্য আগে থেকেই খাদ্যশস্য গুদামজাত করতে থাকে। তখনও পর্যন্ত রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব ছিল। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার শহরের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করতে তৎপর হয়। যদিও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এর উপর অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা এবং রেজা খাঁর কালোবাজারি দুর্ভিক্ষের প্রভাবকে আরও প্রশমিত করে। সরকারের তরফ থেকে চালের বিলি বণ্টন শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[১৫] ফলত মফস্বল গ্রামগুলি অনাহার, অর্ধাহার ও মহামারীতে শ্মশানে পরিণত হয়।

উনিশ শতকে বাংলার বুকে বেশ কয়েকবার দুর্ভিক্ষের অভিঘাত নেমে এসেছিল। অবশ্য সেই দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই সময় বাংলাতে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ছিল ব্যাপক খাদ্যাভাব এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অস্বাভাবিক ভাবে কমে যায়।[১৬] এর সাথে যুক্ত হয় মহামারী, বন্যা কিংবা খরার মতো দুর্যোগ। উনিশ শতকের দুর্ভিক্ষে প্রাকৃতিক কারণের থেকে মানবিক কারণ বেশি দায়ী ছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজস্বের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অতিরিক্ত রাজস্বের চাপ সাধারণ মানুষের হাত থেকে বাড়তি অর্থ বেরিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে কৃষিতে বিনিয়োগের মতো কোনো অর্থ কৃষকদের হাতে ছিল না। কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, সেখানে দ্রুত খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে। সেই বিষয়েও ঔপনিবেশিক সরকারের কোনো হেলদোল লক্ষ্য করা যায়নি। অবশ্য এটা ভুললে চলবে না যে, ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য রেল পথের বিস্তার ঘটানো হয়েছিল। রেলপথ নির্মাণের পেছনে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, রেলের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় খাদ্যশস্য পৌঁছানো সম্ভব হবে।[১৭] কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রেলকে খাদ্যশস্য রপ্তানির বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। যে কারণে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয় এবং খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। উনিশ শতকে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দেয়। বাদ যায়নি মুর্শিদাবাদ জেলাও।

উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলাতে মোট চারটি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল (১৮৬৬, ১৮৭৪, ১৮৮৫, ১৮৯৭ সালে)। তবে সেই দুর্ভিক্ষগুলি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো এতো ক্ষতিকর ও বিধ্বংসী ছিল না। এই জেলাতে দুর্ভিক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কিছু কারণও ছিল। তবে সেটা কতটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা দেখার বিষয়! দুর্ভিক্ষের সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটা সম্পর্ক রয়েছে। বন্যা, খরার মতো দুর্যোগ মাঠে ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। যার পরবর্তী পর্যায় হলো সেই অঞ্চলে খাদ্যশস্যের অভাব। বন্যা মানুষের ধন-সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করলেও, বন্যা পরবর্তী রোগ-মহামারি মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। যার ফলে জমি চাষের জন্য কোনো কৃষককে পাওয়া যায়না। আবার দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে অনেকেই শহরে পাড়ি জমায়। যে কারণে গ্রামের জনসংখ্যা হ্রাস পায়। আগেই বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারি একে অপরের হাত ধরাধরি করে আসে। উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যা, খরার মতো প্রাকৃতিক

দুর্যোগের প্রকোপ বহুবার দেখা যায়। তবে সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ ছিল কিনা, তা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলাতে বাৎসরিক উৎসবের মতো বন্যার দেখা মেলে। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের বিবরণে মুর্শিদাবাদ জেলাতে বন্যা ও খরার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে পোকার আক্রমণে সমগ্র জঙ্গীপুরের দানাশস্য জাতীয় ফসল, যেমন— ডাল, মটর ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হয়।[১৮] জেলাতে যে বন্যা দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে ১৮২৩ সালের বন্যা প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি করে, বিশেষ করে ফসলের। এছাড়াও ১৮৩৪, ১৮৩৮, ১৮৪৮, ১৮৫৬, ১৮৬৬ এবং ১৮৭০-৭১ সালে বন্যা হয়েছিল।[১৯] ১৮৭০ সালের বিধ্বংসী বন্যাতে জেলার বাগড়ি অঞ্চলে ধানের মারাত্মক ক্ষতি হয়। প্রচুর গবাদি পশু মারা যায়। কৃষকদের অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে। যে কারণে ওই অঞ্চলে সাময়িক দুর্ভিক্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার দুর্ভিক্ষ নিবারণ কমিটি নিযুক্ত করে ত্রাণের ব্যবস্থা করে।[২০]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর মুর্শিদাবাদে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষটি দেখা দেয় ১৮৬৬ সালে। তবে এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ মুর্শিদাবাদে খুব একটা পড়েনি। তুলনামূলক ভাবে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে, যেমন— নদিয়া ও বর্ধমানে কিছু মাত্রাই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ লক্ষ্য করা যায়। এই দুর্ভিক্ষের পেছনে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিকে দায়ী করা যায়। ১৮৬৬ সালের জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে চালের মূল্যবৃদ্ধি ঘটার কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। হান্টার সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে মুর্শিদাবাদে টাকায় ৭ থেকে ৯ সের চাল পাওয়া যেত।[২১] যা পূর্বের বছরের তুলনায় অনেক কম। খাদ্যশস্যের অভাবের পেছনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটা হাত ছিল। ১৮৬৫ সালের খরার ফলে মাঠের ফসল মাঠেই শেষ হয়ে যায়। এর ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬৬ সালে বন্যা দেখা দেয়। যদিও সেই বন্যার প্রকোপ দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। ফলত সরকারি ত্রাণ সেভাবে না মিললেও, স্থানীয় মানুষের সাহায্যে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৮৭৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলাতে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি দেখা দেয়। অবশ্য হান্টার সাহেবের গ্রন্থে এটিকে দুর্ভিক্ষ না বলে 'Scarcity' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২২] ১৮৭৩ সালের শেষের দিকে অনাবৃষ্টির কারণে আকালের সৃষ্টি হয়। খাদ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেও, জেলাতে দুর্ভিক্ষের সেরকম বড় কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর পেছনে ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমিকা। সরকার জেলার নদী বন্দরগুলি থেকে খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে কোনো ভাবে খাদ্য বাইরে না যেতে পারে। দুর্ভিক্ষের সময় স্থানীয়দের কাজের জন্য বা পরিস্থিতি বেগতিক বুঝলে কাজ করিয়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অন্নসংস্থানের জন্য রোড সেস কমিটিকে ৭৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। তবে কোনো বড় ধরণের ত্রাণের ব্যবস্থা না করেই এই দুর্ভিক্ষ সামাল দেওয়া হয়েছিল।[২৩]

১৮৮৫ সালে মুর্শিদাবাদ জেলাতে একটি আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষের কথা জানা যায়।[২৪] তবে এই দুর্ভিক্ষের তথ্য জেলার একটি সাময়িক পত্রের বিবরণ থেকে জানা যায়। কামাক্ষ্যানাথ গাঙ্গুলি সম্পাদিত 'প্রতিকার' পত্রিকাতে ১৮৮৬ সালে ১৬ এপ্রিল সংখ্যাতে সরকারের সমালোচনা করে বলা হয়, সরকারের অনমনীয় মনোভাবের জন্য ১৮৮৫ সালের দুর্ভিক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলাতে অনেক মানুষ মারা যায়।[২৫] পত্রিকাতে প্রকাশিত হিসেব অনুযায়ী, খড়গ্রামে অনাহারে মারা যান ৩১ জন এবং কান্দিতে অনাহারে ২৪ জনের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সরকারি বিবরণ অনুযায়ী এখানে কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি। জেলা গেজেটিয়ারগুলিতে এই দুর্ভিক্ষের বিষয়ে কোনো আলোকপাত করা হয়নি। হয়ত আঞ্চলিক ভাবে সংগঠিত দুর্ভিক্ষকে সরকার সেভাবে গুরুত্ব দিতে চায়নি।

উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলাতে যে কয়েকটি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ১৮৯৫ সালে বৃষ্টির স্বল্পতা এবং নদীর জলস্তর নেমে যাওয়ায় ঐ বছরের শরৎকালীন ফসল এবং শীতকালীন ফসলের আংশিক ক্ষতি হয়।[২৬] ১৮৯৬ সালে ভাদোই ধানের উৎপাদন অর্ধেক হয়ে যায়। ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষে সদর মহাকুমার ভাগীরথীর পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলসহ, কান্দি মহাকুমার পূর্বদিকের বেশ কিছু অঞ্চল এবং কালান্তরের বেশ কিছু জায়গা আক্রান্ত হয়েছিল। তবে মুর্শিদাবাদের রাঢ়ের অন্তর্গত বড়োঞা এবং ভরতপুর মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রাঢ় অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা গেলেও (যেমন—১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ) বাগড়ি অনেকটা

ভালো জায়গায় অবস্থান করেছিল। কিন্তু ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ রাঢ় এবং বাগড়ি দুই অঞ্চলকেই প্রভাবিত করে। সুতরাং শেষ রক্ষা আর হলো না। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি দিকে রাঢ় এলাকায় সামান্য বৃষ্টিপাত হলে, ফসল সম্পূর্ণ ক্ষতি হওয়া থেকে নিস্তার পায়। অবশ্য সব মিলিয়ে জেলার গড় উৎপাদন ৭ আনার বেশি হয়নি।[২৭] আমের উৎপাদন মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে বাগড়ি এলাকার মানুষ খাদ্যের জন্য রাঢ়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সেখানকার ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হলে শুরু হয় দুর্ভিক্ষের। দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ শহরের দিকে ভিড় জমাতে থাকে। পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করলে সরকারের তরফ থেকে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি স্থানীয় জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা ত্রাণ কাজে হাত লাগায়।

ত্রাণ ব্যবস্থা

উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলাতে যে দুর্ভিক্ষগুলি হয়েছিল, তার মোকাবেলায় ঔপনিবেশিক সরকারের ভুমিকা কি ছিল? প্রাথমিকপর্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লক্ষ্য ছিল নিজেদের বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক লাভ সুনিশ্চিত করা। ফলত বাংলার মানুষ না খেতে পেয়ে যদি মারা যায়, সেদিকে তাঁদের কোনো দৃষ্টি ছিল না। ইংরেজ কোম্পানি নিজের লাভের দিক বরাবরই দেখে গিয়েছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় কোম্পানির রাজস্বের যাতে কোনো ঘাটতি না হয়, সেই দিকটি দেখা হয়েছিল। এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন রেজা খাঁ। আবার দুর্ভিক্ষ মানে অনাহারে, রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যু। ফলত ফসল আবাদের জন্য চাষি পাওয়া যাবে না। সুতরাং ঘুর পথে কোম্পানির রাজস্বের ক্ষতি। তখন বাংলার রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব বজায় ছিল। তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদ শহরকে মন্বন্তরের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রস্তুত হয়। এখানে লঙ্গরখানা খুলে প্রতিদিন ৭০০০ মানুষকে খাওয়ানো হত। রেজা খাঁর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্য ত্রাণ তহবিল গঠন করা হয়। যেখানে কোম্পানি ৪০০০০, নবাব মোবারাক-উদ-দৌলা ২১০০০, রেজা খাঁ ১৫২০০, রায়দুর্লভ ৬০০০ এবং জগৎ শেঠ ৫০০০ টাকা দান করেছিলেন।[২৮] ১৭৭০ সালের ১ মার্চ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১,৫২,৪৪৩ টাকার চাল মুর্শিদাবাদ জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের বিতরণ করা হয়েছিল। যদিও এই ত্রাণ বড় বড় শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যে কারণে মফস্বল গ্রামীণ এলাকায় মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে।

১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যে কারণে সরকারি উদ্যোগে ত্রাণের কোনো ব্যবস্থাও করা হয়নি। যদিও স্থানীয় স্তরে বেশ কিছু জমিদার বা রাজপরিবারের উদ্যোগে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী শহর ও আশেপাশের এলাকাতে লঙ্গরখানা খুলেছিলেন। ধনী হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ী ধনপতৎ রাও লঙ্গরখানা খুলে অভুক্তদের অন্নের সংস্থান করেন। জেলাতে যে ৮টি লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল তাতে প্রতিদিন ১৮০০ জনকে খাওয়ানো হত। এর মধ্যে বেশির ভাগ ছিল নারী ও শিশু। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে যে ত্রাণ কার্য পরিচালিত হয়েছিল, তার বেশির ভাগ সংগৃহীত হয়েছিল জেলার স্থানীয় মানুষদের উদ্যোগে। সরকারি কোনো সাহায্য আসেনি। ঐ বছরের মাঝামাঝি নাগাদ ধান ফসলের উৎপাদন ভাল হলে খাদ্যভাব কমে আসে এবং ত্রাণকার্যও বন্ধ করে দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষটি স্বল্পকালীন স্থায়ী হওয়ায় অনাহারে মৃত্যুর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।[২৯]

এরপর ১৮৭৪ সালের শেষের দিকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দেয়। যদিও হান্টার সাহেব এটিকে সাময়িক অভাব (Scarcity) বলে উল্লেখ করেছেন। এটা আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ ছিল। যে কারণে সরকার কোনো রকম ত্রাণের ব্যবস্থা না করেই, দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। তবে এই দুর্ভিক্ষে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অন্নসংস্থান করার জন্য রোড সেস কমিটিকে ৭৫০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। ফলত ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে এটাই ছিল সরকারের অবস্থান।[৩০]

১৮৮৫ সালে কোনো দুর্ভিক্ষ হয়েছিল কিনা, সরকারি গেজেটিয়ারে তার কোনো উল্লেখ নেই। ফলত সরকারি সাহায্যের কোনো প্রসঙ্গ উঠে না। হয়ত একেবারে স্থানীয় স্তরেই এই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল। যে কারণে সরকার এর উপর খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করেনি।

উনিশ শতকে যেসব দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। তার মধ্যে ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষটি সবথেকে বেশি মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচার তাগিদে সাধারণ মানুষ শহরের দিকে পা বাড়ায়। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ২০৫ বর্গ মাইল এলাকার প্রায় ১,২৫,০০০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার অতিদ্রুত ত্রাণের ব্যবস্থা করে। মাত্র ২.২৯% মানুষ সরকারি ত্রাণের সুযোগ পেয়েছিল। দাদপুর অঞ্চলের ৪% আদিবাসী মানুষ ত্রাণের আওতায় এসেছিল। প্রায় ৩,৮৪,০০০ জন ত্রাণের সুবিধা পেয়েছিলেন। প্রশাসনিক ব্যয়সহ মোট খরচ হয়েছিল ৬৬,০০০ টাকা। সরকারের পক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও যথেষ্ট প্রশংসনীয়। মহারাণী স্বর্ণময়ী, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, রায় বুধ সিং দুধোরিয়া, যোগেন্দ্র নারায়ণ রাও, রাণী মীনা কুমারী, নরপত সিং প্রমুখ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।[৩১]

এখানেই শেষ নয়, কলকাতার কেন্দ্রীয় ত্রাণ সমিতি ১০,০০০ টাকা জেলাতে ত্রাণ বাবদ পাঠিয়েছিল। হস্তশিল্পের সাথে যুক্ত মানুষেরা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ত্রাণ সমিতি তাঁতি ও সুত প্রস্তুতকারীদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে। যাতে তাঁরা এই দুঃসময়ের মধ্যে নিজেদের অন্নের সংস্থান করতে পারে। যার ফলে প্রায় ১৫০টি পরিবার উপকৃত হয়। এই সময়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো রামকৃষ্ণ মিশনে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই সূত্র ধরে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী অখন্দানন্দের উদ্যোগে যে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা গ্রহণ করে বহু মানুষ নিজেদের জীবন রক্ষা করে।[৩২]

সুতরাং, দুর্ভিক্ষ বা আকাল সাধারণ মানুষের জীবনে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা বহন করে নিয়ে আসে। মুর্শিদাবাদ জেলাতে একেরপর এক দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের ছায়া সমগ্র বাংলার সাথে সাথে এই জেলাতেও নেমে আসে। আবার আঞ্চলিক স্তরে বন্যা, খরার মতো পরিস্থিতি দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। এর সাথে যুক্ত হয় ঔপনিবেশিক সরকারের অতিরিক্ত রাজস্বের চাপ, খাদ্যশস্যের কালোবাজারি, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। আকালের সময় মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে মৃত্যুবরণ করে। অনেকে বাঁচার তাগিদে শহরের চলে যান। সেখানেও না খেতে পেয়ে অনেকেই মারা যান। আর যারা গ্রামে থেকে গেলেন তাঁরা অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করে, অনাহারে-অপুষ্টিতে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। বন্যা যেমন দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী, ঠিক তেমনই বন্যা পরবর্তী মহামারি মানুষের কাছে ত্রাসের সৃষ্টি করে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলাতে দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয় ছিল।

সূত্র নির্দেশ:

১. *সংসদ বাংলা অভিধান*, (২০১৮), সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৪১৫।
২. রায়চৌধুরী, বিনতা, (১৯৯৭), *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য*, সাহিত্যলোক, পৃ. ২।
৩. *ভারতকোষ (চতুর্থ খণ্ড)*, (১৯৭০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৭৫।
৪. Singh, Upinder, (2009). *A History of Ancient and Early Medieval India*, Pearson, p. 329.
৫. সামন্ত, অরবিন্দ, (২০০৩), *প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানুষ*, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৭৯।
৬. হাবিব, ইরফান, (২০১৫), *মানুষ ও পরিবেশ: ভারতবর্ষের বাস্তুতাত্ত্বিক ইতিহাস*, অনু. জিনিয়া মুখার্জি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ৯১।
৭. *তদেব*।
৮. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস, (২০১৬), *মুর্শিদাবাদে মন্বন্তর*, আকাশ, পৃ. ২০।
৯. সামন্ত, অরবিন্দ, (২০০৩), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮০।
১০. চৌধুরী, কমল, (২০১১), (সম্পা.), *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস: দ্বিতীয় খণ্ড*, দে'জ, পৃ. ৩৭৯।
১১. Hunter, W. W., (1876). *A Statistical Account of Bengal (Vol. IX)*, Trubner & Co., p. 138.

১২. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস, (২০১৬), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪।
১৩. *তদেব।*
১৪. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার, (১৯৮৫), *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতক)*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, পৃ. ৫৭।
১৫. চৌধুরী, কমল, (২০১১), (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭৯।
১৬. সামন্ত, অরবিন্দ, (২০০৩), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪।
১৭. হাবিব, ইরফান, (২০১৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪।
১৮. Hunter, W. W., (1876). *op.cit*., p. 131.
১৯. *Ibid*., p. 132.
২০. *Ibid.*
২১. Hunter, W. W., (1876). *op.cit*., p. 139.
২২. *Ibid*., p. 140.
২৩. *Ibid*.
২৪. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস, (২০১৬), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০।
২৫. *তদেব।*
২৬. O'Malley, L. S. S., (1914). *Bengal District Gazetteers: Murshidabad*, The Bengal secretariat book depot, p. 112.
২৭. *Ibid*.
২৮. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস, (২০১৬), *পূর্বোক্ত* , পৃ. ৪৫।
২৯. O'Malley, L. S. S., (1914). *op.cit*., p. 111.
৩০. *Ibid*.
৩১. O'Malley, L. S. S., (1914). *op.cit*., pp. 113-114.
৩২. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস, (২০১৬), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫।